নারী জাগরণ ও বাংলাদেশের প্রশাসনে নারীদের ভূমিকা

আয়েশা আজিম

১.০ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশ এখনও চরম ক্ষুধা, বস্ত্রের অভাব, গৃহহীনতা, অপুষ্টি ও নিরক্ষরতার মত মৌলিক সমস্যায় জর্জরিত। এখনও এসব সমস্যা সমাধানে আমরা অক্ষম রয়েছি। আমাদের জীবনের আশা, স্বপ্ন ও সুন্দর সম্ভাবনার জন্য উল্লিখিত সমস্যাসমূহের আশু সমাধান ও সমাজের আর্থ–সামাজিক পরিবর্তনের ও উন্নয়নের বিশেষ প্রয়োজন। 'উন্নয়ন' বলতে এখানে আমরা একাধারে সমাজের ধনী, দরিদ্র, নারী ও পুরুষ উভয়ের উপকারে আসার উন্নয়নের কথাই বলছি। কেননা উন্নয়নের সংজ্ঞা, যথা–"বস্তুগত সভ্যতার ভিত্তিতে জীবনের উৎকর্ষ সাধন" অর্থে আমরা ধরে নেব সমাজের নারী–পুরুষের ভেদাভেদ থাকা সত্বেও এর সুফল উভয়ে সমানভাবে পেতে পারে। কিন্তু যেহেতু আমাদের সমাজে নারীদের অবস্থান পুরুষের চাইতে কম শক্তিশালী সেহেতু প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন এখনও রয়েছে এ সমাজের পুরুষের পক্ষে।

১.১ সুতরাং এদেশের সত্যিকারের উন্নয়ন হতে হলে নারী সমাজের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ অপরিহার্য। উন্নয়নমূলক কাজে নারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং এ পর্যন্ত উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা কতটুকু বিস্তার লাভ করেছে বা করছে তার সঠিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। যদিও আমরা বলে থাকি 'উন্নয়ন শ্রেণী নিরপেক্ষ' কিন্তু কার্যতঃতা নয়। এদেশের নারীরা সব ব্যাপারে পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। তাদের উন্নয়নের নীতি নির্ধারণ করে পুরুষেরা। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতেও নারী আন্দোলন এখনও পর্যন্ত বিতর্কিত । ঐসব দেশের নারী আন্দোলনসমূহ উন্নয়ন দর্শনে এখনও তেমন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। সত্যিকার অর্থে নারীদের মানবাধিকার এখনও পরিপূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারেনি।

১.২ সভ্যতার আদিযুগ অর্থাৎ শিকার যুগ হতে প্রথম পর্যায়ে নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না। জীবন ধারণে প্রধান অবলম্বন ছিল শিকার। উৎপাদন ব্যবস্থায় উভয়ে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতো। পুরুষের চেয়ে নারী কোন কর্মে পিছিয়ে ছিল না। উৎপাদন ব্যবস্থায় জড়িত হয়েও নারীকে আরও দায়িত্ব পালন করতে হত। যথাঃ সন্তান ধারণ এবং সন্তান পালন। প্রকৃতিগতভাবে এদুটো কাজ করতে গিয়ে ধীরে ধীরে নারীরা পুরুষের চাইতে পিছিয়ে পড়ে এবং এদু'টি কাজ এক সংগে করতে গিয়ে নারীরা তাদের সামাজিক জীবনের অবস্থান সংকীর্ণ করে ফেলে। স্বভাবতভাবে, জীবন চলার জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে, জীবন ধারণের জন্য এবং প্রয়োজনীয় আহার্যের জন্য নারীকে হাত পাততে হল পুরুষের কাছে। নারী হয়ে যায় পুরুষের উপর নির্ভরশীল। সে সময় হতে নারীকে বিশেষ করে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্নভাবে নারীরা পুরুষের হাতে বন্দী হতে থাকে। পুরুষ জাতি এভাবে ধীরে ধীরে নারীদের মানব সত্বার অধিকার কেড়ে নেয়। নারীদের জন্য এমনকি প্রণয়ন করে নতুন নতুন আইন। তারা কখনো প্রয়োগ করেছে ধর্মীয় অনুশাসন, কখনও সামাজিক অনুশাসন এবং কখনও পারিবারিক অনুশাসন। এ ধরনের অনুশাসনগুলোর সাথে ভ্রান্ত ধারণা, এক পেশে শিক্ষা, বিভিন্ন কুসংস্কার ইত্যাদি দিয়ে নারীদের প্রায় অন্ধ করে রাখে। নারীকে ধর্মে–বিশেষভাবে ইসলাম ধর্মে যে স্থান দিয়েছে তার সত্যিকারের প্রচার বা প্রয়োগ পুরুষ কখনও করেনি। বরঞ্চ নেতিবাচক ধারণাগুলোকে ফলাও করে দেখিয়েছে শুধু। সুতারাং এ ধরনের ভুল ধারণা নিয়ে মানসিকভাবে নারী জাতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমাগত কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে থাকে, পুরুষের ইচ্ছামত পুরুষের ক্রীড়ার পাত্র হিসাবে বেঁচে থাকে। এভাবে তাদের আত্মোপলব্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, হাজারো বছর ধরে।

২.০. আমাদের এই উপ–মহাদেশের নারীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সত্যিকার উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি কোন দিন তাদের জীবনে আসেনি। অশিক্ষা, বিভিন্ন ঐতিহ্য ও কুসংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ থাকল তারা হাজার বছর ধরে। এই উপ–মহাদেশের নারী জাতির এরূপ পিছিয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে তেলেগু'র ছোট গল্প ও উপন্যাস লেখক গোঁপি চাঁদ তাঁর উপন্যাস 'দি লাইফ অব ইনকমপিটেন্ট পারসন'–এ লিখেছেন যে এই উপ–মহাদেশের নারী জাতির জীবনটা যেন এক অনুপযুক্ত লোকের মত। তাদের সব কিছুতেই বাধা, সব সময় নমনীয় ও নীরব দর্শকের মত তাদের মৌন থাকতে হয়। কারও উপর রাগ করা তাদের শোভা পায় না সেটা কৃষ্টি বিরুদ্ধ। কারো মনে কষ্ট দেয়া, বিশেষ করে আত্মীয়–স্বজনের মনে যাতে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি না হয় সেদিকে তাদের সর্বদা সজাগ থাকতে হয়। এ সব কারণে মহিলারা সব সময় হীনমন্যতায় ভুগতে থাকেন। একজন মানুষের কর্মদক্ষতার মাধ্যমে তার নিজস্ব উন্নয়ন হয়। স্বাধীনতা এ সুযোগটি এনে দেয়। কিন্তু এই ধরনের স্বাধীনতা হতে এ দেশের মহিলারা সর্বদা বঞ্চিত রয়েছে। আমাদের উপ–মহাদেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আমাদের মহিলাদের

জীবন গড়ে উঠেছে অনুপযুক্ত ও অক্ষম ব্যক্তির ন্যায়। বেশীর ভাগ নারী তাদের নিজের জীবনের কোন কাজে লাগে না, অপরের কোন কাজেও আসে না।

২.১. মহিলাদের এ ধরনের পিছিয়ে থাকার সম্ভবতঃ তিনটি কারণ ধরা যেতে পারে। প্রথমতঃ শিশুকাল হতে মহিলাদেরকে পুরুষের প্রাধান্যের ধারণাকে মেনে নিয়ে, পিছিয়ে পড়ার মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠতে হয়– যেটাকে প্রখ্যাত লেখিকা ভি, কে, রেনডল পলদেন "শিশুকালীন সামাজিকতার প্রভাব" (বা এফেক্ট অব চাইল্ডহুড সোস্যালাইজেশন) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া মাতৃত্ববোধ, সন্তান লালন, ঘর পরিচর্যা এইসব করতে গিয়ে নারীরা পুরুষের তুলনায় অগ্রগতিতে নিজেদের পিছিয়ে রেখেছে। তৃতীয়তঃ সমাজের বা পরিবারের ক্ষমতা বিন্যাসে মহিলাদের অবস্থানগত দুর্বলতা বা মহিলাদের নিজস্ব সাংগঠনিক অক্ষমতা। এর কারণ নারী সমাজ এত যুগ পর্যন্ত কোন রকম ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলতে পারেনি।

২.২. ইতিহাসের দিকে তাকালে এ কথার সমর্থন পাওয়া যাবে। নারীরা যুগে যুগে অবহেলিত ছিল। তবে একথা সুস্পষ্ট যে মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীদের উপর শোষণ, অত্যাচার ও বঞ্চনা কোন দিন শেষ কথা হয়ে থাকেনি। যুগে যুগে অত্যাচার ও শোষণ যখন চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তখন নারীরা বাধ্য হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, নিজেদের সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের মধ্যে সচেতনতা জন্মেছে এবং তারা সনাক্ত করতে পেরেছে তাদের নিজেদের অবস্থান কোথায়। তাই আমরা দেখতে পাই মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে উন্নত দেশগুলিতে নারীরাও পুরুষের সাথে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

৩.০. পাশ্চাত্যের নারীদের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় পূর্বে নারীদের তারা নিম্নশ্রেণী হিসাবে দেখত। এরিসটোট্‌ল লিখেছেনঃ "Female nature is affected with a natural defect." সেইন্ট টমাস বলেছেনঃ "A female is defective", সেকসপিয়ার বলেছেনঃ "Frailty thy name is woman," উল্লিখিত উক্তিসমূহের মধ্য হতে নারী জাতির প্রতি তাদের মনোভাবের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। এলিস ক্লার্কের সতের শ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড হতে জানা যায় যে, সে দেশের নারীরা শিল্প বিপ্লবের পূর্বেও কর্মঠ ছিল এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু তারা সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের জিঞ্জিরে আবদ্ধ ছিল অনেকদিন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলির নারীদের অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। যুগ যুগ ধরে তারা শোষিত ও অবহেলিত হয়েছে।

৩.১. যাহোক বর্তমান পৃথিবীতে নারী সমাজের অগ্রগতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা মাত্র। নারী সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমাজে নারীদের অধিকার দেয়ার

নিমিত্তে নারীদের সমান অধিকারের দাবী আন্তর্জাতিকভাবে আসলে স্বীকৃত হয় মাত্র ১৯৩০ সাল হতে। ১৯৩৭ সালে "লীগ অব নেশন" নারীদের লিগেল স্টেটাস এর উপর চিন্তা ভাবনা শুরু করে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়াতে মহিলাদের উপর এরূপ চিন্তাভাবনা কিছুদিন স্থগিত থাকে। ১৯৪৫ সালে সানফ্রান্সিসকোতে জাতিসংঘের বৈঠকে হয় ও নারীর সমান অধিকারের কথা আলোচিত হয়। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নারী সমাজের অধিকার উন্নয়নে ও বিভিন্ন সমস্যার উপর সুপারিশমালা প্রস্তুত করে।

৩.২. ১৯৪৮ সালে এলেন রুজভেল্ট, আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট থিয়োডর রুজভেল্টের বিধবা স্ত্রী লিখিতভাবে ঘোষণা করেন যে, "মানব জাতির, সমাজের অথবা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সমান অধিকার হচ্ছে-স্বাধীনতা"। তিনি নারী পুরুষ উভয়ের মাঝে যে অসম সম্পর্ক রয়েছে তা উল্লেখ করেন। মাত্র ১৯৫২ সালে নারী সমাজের অধিকার সম্পর্কিত প্রথম আইন সম্মত প্রক্রিয়াটি প্রণীত হয়। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নারী সমাজের রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশনের মাধ্যমে মহিলারা ভোট দেবার অধিকার পায়। মাত্র ১৯৫৭ সালে নারীরা অন্য জাতির বা অন্য দেশের লোকের সাথে বিবাহ করলে নাগরিকত্ব হারাবেন না এটা সাব্যস্ত হয়। ১৯৬৫ সালে নারীদের বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং বিবাহে স্বতস্ফূর্ত মত নেয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়।

৩.৩. এতদ্ব্যতীত উন্নয়নমূলক কাজে নারী সমাজের গুরুত্ব অব্যাহত রাখার জন্য নারী সমাজের অবস্থার উন্নয়নকল্পে এবং নারী উন্নয়নে সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি এই ত্রিমুখী লক্ষ্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়। ১৯৭৫ সালকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে "আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ" ঘোষণা করা হয়। এবং এই সম্মেলনে ১০০০ এর বেশী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত সেমিনারে ৭০ ভাগ মহিলা অংশগ্রহণ করেন।

৩.৪ . ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো শহরে গৃহীত প্রস্তাবাবলীতে ১৯৭৬ হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সময়কালকে "নারী সমাজের সমানাধিকার উন্নয়ন ও শান্তির" লক্ষ্যে জাতিসংঘ নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। আবার ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেন বিশ্বনারী সম্মেলনের মাধ্যমে ১৯৮০-৮৫ সময় কালের জন্য চাকুরী, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি সম-অধিকার, উন্নয়ন ও শান্তি এই তিনটি লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত করার উপর জোর দেয়া হয়।

৩.৫. ১৯৮১ সালে নারী সমাজের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের নিমিত্তে কনভেনশন সংগঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে বিশ্বনারী সম্মেলনে, নারী দর্শকের মুল্যায়ন এবং তা পর্যালোচনার মাধ্যমে পরবর্তী কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সম্মেলনের উপর বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট লেখা হয়। এরূপ একটি রিপোর্ট হতে জানা যায় যে নারীরা বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও তারা বিশ্বের আয়ের মাত্র এক দশমাংশ এবং সম্পত্তির মাত্র এক শতাংশের অধিকারিনী।

উল্লিখিত তথ্য হতে পৃথিবীর উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের নারী সমাজের প্রতিকূলে বিভিন্ন বিরাজমান বৈষম্যসমূহের আন্তর্জাতিক চিত্র জানতে পারা যায়।

৪.০. এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মহিলাদের উন্নয়ন ও সামাজিক অবস্থান বিশদভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এদেশের মহিলারা যুগ যুগ ধরে শাসিত ও শোষিত হয়েছে। সেটা নারী পুরুষের শারীরিক ভিন্নতার দোহাই দিয়ে হোক, অর্থনৈতিক কারণে বা ধর্মের দোহাইয়ে হোক–পুরুষ হওয়ার কারণে নারীর উপর প্রভুত্ব করার অধিকার এদেশের পুরুষ সমাজ পেয়েছে। এদেশের পুরুষ শাসিত সমাজ ধর্মীয় অনুশাসনেরও অপব্যবহার করেছে। এছাড়া আমাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, ইতিহাস, ধর্ম, মূল্যবোধ ও জীবন দর্শনে দেখা যায় নারীর স্থান রয়েছে সব সময় নেপথ্যে।

৪.১. বাংলাদেশের মহিলাদের জাগরণের জন্য তাদের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন বাংলাদেশের মহিয়সী নারী "বেগম রোকেয়া"। তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের মধ্যে জাগরণ আনার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি পুরুষের জিঞ্জির হতে নারী মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই প্রজ্ঞাশীল মহিলা বুঝেছিলেন পুরুষের সম মর্যাদায় এদেশের নারী সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে এদেশের নারী সমাজের উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

৪.২. বস্তুতঃপক্ষে নারী পুরুষ উভয়ের বহুবিধ উৎপাদন মুখী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকাই একটি জাতিকে শক্তিশালী, সম্পদশালী এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। একমাত্র উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জন সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারে জাতির মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো যায়।

৪.৩. যখনই পুরুষের পরিশ্রমের সাথে সাথে তুলনামূলকভাবে নারীদের পরিশ্রমকে অর্থকরী উপার্জন হিসাবে ধরা হয় তখনই সংসার, পরিবার ও সমাজে তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাথে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মনোভাব পরিবর্তনও বিশেষভাবে জড়িত। অর্থাৎ মহিলা জনসংখ্যা যখনই জনশক্তিতে পরিণত হয় তখনই একটি দেশের সত্যিকারের উন্নয়ন আসে এবং এভাবে সমাজ ও জাতি উপকৃত হয়।

৪.৪. ১৯৪৭ সালে ভারত উপ–মহাদেশে দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ তদানীন্তন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময় (পাকিস্তান আমলে)মহিলাদের সামাজিক স্থান ও অধিকার পুরুষের সমমর্যাদায় ছিল না। পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে জনসাধারণের সম–অধিকারের কথার উল্লেখ সত্বেও তা কার্য্যত সম্ভব হয়নি।

৫.১. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার ফলে এদেশের নারীদের জীবনে কিছুটা পরিবর্তন আসে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এদেশের নারীদের উপর অনেক নির্যাতন হয়। অনেকে নিকটতম আত্মীয় ও স্বজন হারায়। বিপর্য্যস্ত আর্থ–সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে শতাব্দীর বাঁধন খুলে যায় এবং তাদের জীবনে আসে পরিবর্তন। তারা পরিবারের নূন্যতম চাহিদা মেটানোর জন্য ধীরে ধীরে বাইরের জগতে এগিয়ে এসে খাপ খাওয়াতে শুরু করে।

৫.২. এভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কারণে নারীরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ শুরু করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে কিভাবে পুরুষ ও নারীদের উন্নয়ন করতে হবে তার উপযুক্ত নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া জনসম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের নিমিত্তে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং নারী জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য সরকার তৎপর হন। ফলে ১৯৭৬ সালে মহিলাদের জন্য মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে সরকারী ও আধাসরকারী সংস্থার সর্বস্তরে মহিলাদের নিয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে সরকারী সংস্থায় ১০% কর্মকর্তা এবং ১৫% ভাগ কর্মচারীর পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়।

৫.৩. এখানে আরও উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মহিলা সংক্রান্ত অংশে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্দেশ্য, যথাঃ– (১) মহিলাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, (২) তাদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, (৩) অনানুষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উপর প্রশিক্ষণ দান এবং (৪) মহিলাদের সর্বাংগীন উন্নয়নের জন্য নীতি নির্ধারণ ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে মহিলা সংগঠন ও সমাজের ছিন্নমূল মহিলাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির সুযোগ করে দেয়া হয়। বর্তমান মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট প্রায় ৪৫৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে লক্ষাধিক মহিলা বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে এর ব্যাপক বৃদ্ধি হবে বলে আশা করা যায়।

৬.০. স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ–দেশে জনসংখ্যার অর্ধেকাংশ নারী জাতির উন্নয়নের এবং পুরুষ সমাজের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনের একটি শুভ ও উজ্জ্বল দিক। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে জনসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা হয়। জন বহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পৃথিবীতে সুপরিচিত। অবশ্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে নারীরা এখনও অনেক অনগ্রসর। বাংলাদেশে বর্তমানে স্রোতের মত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ শিক্ষা ও উন্নয়নে স্থবিরতা এবং ভূমিহীন ও বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য নারী পুরুষ সম্মিলিতভাবে দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

৬.১. স্বাধীনতার পর পর সিভিল সার্ভিস সংস্কার করার নিমিত্তে সংবিধানে ১৩৬ নং অনুচ্ছেদের ক্ষমতা বলে বাংলাদেশ সিভল সার্ভিসের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। সেহেতু আমরা দেখতে পাই ১৯৭২ সালে দু'টি রিফর্ম কমিটি তৈরী করা হয়, যথাঃ– (১) প্রশাসনিক কর্মের পুনর্বিন্যাস (এ্যাডমিনিষ্ট্রেভি সার্ভিস রিঅরগানাইজেসন –এ,এস, আর, সি,) এবং (২) জাতীয় বেতন কমিশন (এনসিসি)। উক্ত কমিশনদ্বয় তাদের রিপোর্ট ১৯৭৩ সালে জমা দেয়। এ, স, আর, সি, ১০টি গ্রেডের পদের সুপারিশ করে এবং জাতীয় বেতন কমিশন উল্লেখিত ১০টি গ্রেডের সুপারিশ দেন। ১৯৭৬ সালে সরকার রশিদ কমিশন নামে আর একটি কমিশন গঠন করে। ১৯৭৭ সালে এই কমিশন রিপোর্ট জমা দেয় এবং ১৯৮০ সালে সরকার ২৮টি ক্যাডারের সিভিল সার্ভিসের ঘোষণা করে। ১৯৮৫ সালে আরও দু'টি ক্যাডারের সৃষ্টি হয়। এছাড়া উচ্চ পর্যায়ের আরো একটি ক্যাডার রয়েছে যা সিনিয়র পুল * নামে পরিচিত। এই পুলে সব ক্যাডারের অফিসারদের প্রবেশের সমান প্রবেশাধিকার রয়েছে।

৬.২. মূলতঃ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস–ব্রিটিশ, ভারত ও পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের বিবর্তনের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ। ভারত উপ–মহাদেশে বৃটিশ আমলে সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের নিযুক্তির কোন সুযোগ ছিল না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে যদিও জনসাধারণের সমান অধিকার উল্লেখ ছিল কিন্তু কার্যত তা দেখা যায় না। পাকিস্তান সময়ে নারীদের সাভিল সার্ভিসে নিযুক্তি বর্তমান বাংলাদেশের তুলনায় নিরপেক্ষভাবে হয়নি। কেবলমাত্র গুটিকতক সার্ভিসে যথাঃ অডিট এণ্ড একাউন্ট সার্ভিস, আয়কর সার্ভিস এবং পোষ্টাল সার্ভিসে মহিলাদের নিযুক্তির জন্য উপযুক্ত বলে ধরা হত। মহিলারা সমগ্র পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হত না। মেধা থাকা সত্বেও তাদেরকে অন্য কোন সার্ভিসের জন্য উপযুক্ত বলে ধরা হতো না। এতদ্ব্যতীত মহিলাদের কর্মরত অবস্থায় বিবাহ বা পুনঃবিবাহের অনুমতি ছিল না। বিবাহ বা পুনঃবিবাহ হলে তাদের কর্মক্ষেত্র হতে পদত্যাগ করতে হত। এর কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে মহিলারা বিবাহের পর যোগ্যতার সাথে কাজ করতে অক্ষম।

৬.৩. এতে প্রমাণিত হয় যে, ১৯৪৭ সালের স্বাধীন (পাক আমলে) নাগরিক হয়ে মেধা থাকা সত্বেও সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তি মহিলাদের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ছিল না ছিল প্রাদেশিক পর্যায়ের। সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং আমলাতন্ত্র পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের স্থান একটি নির্দিষ্ট সুবিধাজনক অবস্থায় রাখা হয়েছিল তাই স্বাধীন বাংলাদেশে মহিলাদের কর্মজীবনে বিরাট চাঞ্চল্যকর পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সর্বমোট সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১৯,৪৮৬ এবং তন্মধ্যে ক্যাডারভূক্ত মহিলাদের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১৯৩৫ অর্থাৎ শতকরা

---

* (বর্তমানে এই ক্যাডারের বিলুপ্তি হয়েছে)।

প্রায় ১০% (১৯৮৭ সালের তথ্যানুযায়ী)। ১৯৭২ সাল হতে এ পর্যন্ত মহিলাদের সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভূক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলারা তাদের কর্তব্য দক্ষতার সাথে পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা সর্বক্ষণ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অন্যান্য দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করছেন। সম্প্রতি একটি গবেষণায় (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা) দেখা গেছে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে মহিলারা অতি দক্ষ বলে চিহ্নিত হয়েছেন। উল্লেখিত গবেষণায় দ্রষ্টব্য যে, মহিলারা প্রশাসনিক, বিচারকার্য নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন, প্রকল্প পরিচালনা, পরিদর্শন–প্রভৃতি কাজে পুরুষের ন্যায় নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনে সমর্থ হচ্ছে। নিম্নের সারণী হতে এর প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ–

সারনী নং–১

উর্ধতন কর্মকর্তার দৃষ্টিতে পুরুষ ও মহিলার কর্তব্যে সমকক্ষতার তুলনা

পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তার তুলনা সম্পর্কিত	উত্তরদানকারী উর্ধতন কর্মকর্তার সংখ্যা	শতকরা হার
মহিলা কর্মকর্তা, পুরুষ কর্মকর্তার সমকক্ষ	৩৭	৩৭%
মহিলা কর্মকর্তা, পুরুষ কর্মকর্তার মোটামুটি সমকক্ষ	৪২	৪২%
মহিলা কর্মকর্তা, পুরুষ কর্মকর্তার সমকক্ষ নয়	১৯	১৯%
নিরুত্তর	০২	০২%
	১০০	১০০%

৬.১. উল্লিখিত সারণীর ফলাফল হতে প্রতীয়মান হয় যে, মনোভাব যাচাই করা হয়েছে এমন ১০০ জন কর্মকর্তার মধ্যে শতকরা ৪২+৩৭ অর্থাৎ সর্বমোট ৭৯ ভাগ উর্ধতন কর্মকর্তা মহিলা কর্মকর্তাদেরকে পুরুষ কর্মকর্তাদের সমকক্ষ ও মোটামুটি সমকক্ষ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মাত্র ১৯জন কর্মকর্তা মহিলা কর্মকর্তাদের পুরুষের সমকক্ষ বলে মনে করেন না। এক্ষেত্রে গর্বের সাথে বলা যায় যে, বর্তমানে যে সমস্ত মহিলা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন তাদের বেশীর ভাগই কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হচ্ছেন। তবে মহিলা কর্মকর্তা সম্পর্কে জনগণ এখনও সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান নন। এর জন্য প্রয়োজন আরো ধৈর্য্য ও সময়ের। যাহোক বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশেষ করে প্রশাসনিক কাজে মহিলাদের অবদান জাতির উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই অবস্থার আরও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে।

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ

১। মানবাধিকারঃ পঞ্চাশটি প্রশ্ন ও উত্তর,মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৪০তম বার্ষিকী, ১৯৮৪–১৯৮৮, জাতিসংঘ, ঢাকা, ১৯৮৭।

২। হনম, আখতার খালিদা, " হেলথ এণ্ড পপুলেশন প্লানিং", জাতীয় বার্ষিক সম্মেলন, ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৮৯।

৩। ইসলাম, সামিমা ও বেগম জাগিরা, "ভিকটিমস অব ভায়োলেন্স", ঢাকা, দি এশিয়ান ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৫।

৪। হক, এ, কে, এম, এবং বালা, হিরালাল "সিভিল সার্ভিসে মহিলা", বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা, ১৯৮৭।

5. Charlton Sue Elan M, Women in Third World Develpment.

6. Ahmed Syed Giasuddin, "Administrative Structure in Bangladesh: a Brief Narration of Its Historical Antecendents and Modern Process.," Dhaka, Dhaka University, 1987.

7. Begum Rowshanara and Islam Shamima, (EDS) Mid-decade World Conference on Women: Bangladesh Perspective, Dhaka, UNICEF, 198